শয়নযান

ভাস্কর চক্রবর্তী

ঐতিহ্য

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহভাজনেষু

ভূমিকা

কোনো গল্প না, উপন্যাসও নয়। তবে কি স্মৃতিকথা কোনো? জার্নাল? ঐরকমই হবে কিছু একটা। লেখার কথা ছিল কবিতা, লিখে ফেললাম ঘোড়া, মৃত্যু, নদীর কথা। অসুখের কথা। বই আর তাসুড়েদের কথা। প্রেম আর কবিতার কথা। ছেলেবেলার কথা। এখনকার কথাও।

কবিতা লেখেন এমন যে কেউই লিখতে পারতেন এই লেখা। যে লেখা, বিশেষত, 'ব্যক্তিগত হওয়া'য় ঝিম মেরে আছে।

একটা পুরস্কার জুটেছিল হঠাৎ। দিল্লির। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের। সেই পুরস্কারের কথানুযায়ী, এই লেখা। ঐ সংস্কৃতি বিভাগের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ, অরিজিৎ কুমারের কাছে যিনি বেস্ট-সেলারের দু-একশো কিলোমিটার দূরের এই বইও প্রকাশে উৎসাহী হলেন।

ভাস্কর চক্রবর্তী

‘শয়নযান’-এর রজতজয়ন্তী ঐতিহ্য সংস্করণ : কিছু কথা

‘শয়নযান’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক ২৫ বছর আগে– সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে। কী অদ্ভুত সমাপতন! ২৫ বছর পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা ‘ঐতিহ্য’– প্রকাশক আরিফুর রহমান নাইম ভাস্কর চক্রবর্তীর এই প্রকাশের আগ্রহ দেখালেন, যা যথার্থই ধন্যবাদার্হ।

‘শয়নযান’ সম্পর্কে স্বয়ং কবি লিখেছিলেন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়– ‘কোনো গল্প না, উপন্যাসও নয়। তবে কি স্মৃতিকথা, কোনও? জার্নাল? এরকমই হবে কিছু একটা।’

১৯৯৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন ভাস্কর। সেই বৃত্তিপ্রাপ্তির শর্তানুযায়ী লেখা এই বই; যা পড়তে পড়তে বারবার পাঠকের মনে হবেই এত চমৎকারভাবে, এত স্মৃতিকাতরতার মায়াময় স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে গদ্যে লিখিত হতে পারে এমন বই!

ভ্রাতৃপ্রতিম কবি পিয়াস মজিদের আগ্রহ ও উৎসাহেই প্রকাশ হচ্ছে এই বই, তার প্রতি অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

বাসবী চক্রবর্তী
কলকাতা
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শ য় ন যা ন

যদি না-জিততে পার তো জিতো না, কিন্তু তুমি হেরেও যেয়ো না তা' বলে।

এমন একটা মোলায়েম কথা নিজের মনে আওড়াতে আওড়াতে হাঁটছিলাম আমি। আমার মাথা আজকাল আর তেমন কাজ করে না। বড়োই মন্থর হয়ে এসেছে। তবুও বুঝতে পারছিলাম আমি, এক টুকরো হাসি ভেসে উঠল আমার মুখে, যখনই আবার মনে পড়ল কথাটা।

—অমীমাংসিত খেলা?

নিজের মনেই কথাটা আমি তরতরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম নিজের দিকে। যে অল্পতেই ধসে যাই আমি, সেই আমার আজ হলোটা কী? মজা করছি? ঠাট্টা-রসিকতা করছি? রাস্তায় অবশ্য যখন বেরোয় মানুষ তার দুঃখিত মুখটাকে সে ঘরের কোণে রেখে আসে। আমার বোধহয় এই সাধারণ নিপুণতাও নেই। মুখোশের ভিড়ে অসহায় একটা মুখ নিয়ে বড়োই কাহিল হয়ে থাকি আমি। কিন্তু, দোহাই, 'বেচারা' বলে আমাকে গালাগালি দেবেন না। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার একটা অভ্যেস আমার আছে বলেই, বলে ফেললাম কথাটা। জানবেন, আমি ঠিক আছি। আমার মতো করেই বেঁচে আছি আমি। আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি ভুল জীবন কাটাচ্ছি? আপনি যে-জীবনটা কাটাচ্ছেন সে-সম্পর্কে আপনার মতামতটা কী? হ্যাঁ, আমি বাড়িতে ফিরছি। বেশ কিছু মানুষেরই বোধহয় নিজস্ব একটা শহর থাকে। আমার সেই ভালোবাসার শহরের ভেতর দিয়ে, এক সুগন্ধের ভেতর নিয়ে, আমি এখন বাড়ি ফিরছি। কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজারের দিকে একা-একাই হেঁটে চলেছি আমি। এক কাপ লেবু-চা খাব আমি শ্যামবাজারে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। হয়তো সেই একা-একাই। অথবা উড়নচণ্ডী কিছু ছেলের সঙ্গে যাদের কোনো ব্যাকরণ নেই। এই ঘেমে ওঠা শহরটাও চায়, তাকে পুরোটাই অনুবাদ করি আমি। ট্রামে-বাসে তো আজ আমি উঠতেই পারতাম। কিন্তু আমার ভাবনাগুলোকে নিয়ে আজ আমি একটা খেলা

করতে চাইছি। আমি কবিতা লিখি কিন্তু আমি কবি নই। হতে পারতাম কোনো খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ই তো হতে পারতাম আমি। কিন্তু তবুও আমি কোনো খেলোয়াড়ও নই। মাস্টারমশাই হিসেবে কি আমাকে ভাবা যায়? এ-বিষয়েও আমার এত সঙ্কোচ, একেক সময় মনে হয়, যেন মাস্টারি করতে এসেই কোনো অপরাধ করে ফেলেছি আমি। আমি নিজেই তো পড়াশুনা করতাম না ছেলেবেলায়। স্কুল পালাতাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি নিজেকে শুধু নষ্ট হতে দিয়েছি, ভেসে যেতে দিয়েছি, উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে চেয়েছি নিজেকে। দ্বিধা আর শঙ্কা, এই নিয়েই আমি এক বিতিকিচ্ছিরি আমি।—কোন্ বিছে আমাকে কামড়েছিল? কোন্ অন্ধতা, বধিরতা, আমাকে ঠেলে দিয়েছিল অস্বাভাবিকতার মাঝখানে?

২

মৃত্যুর সঙ্গে আগে ঝগড়াঝাঁটি হতো আমার, এখন আর হয় না।

বুড়িয়ে গেলাম নাকি আমি? ফ্যাকাশে হয়ে গেলাম? এই তো সেদিন দশ বছর বয়স ছিল আমার, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিলাম পিসিমার বাড়িতে, আর এক মুহূর্তে একেবারে এই পঞ্চাশ! রাশি রাশি গানের মধ্যে 'মাধবীরাতে মম মনবিতানে' কিংবা 'বাঁধো না তরীখানি আমারই তরুমূলে' গানদুটো এখনও আমি আবছাভাবে শুনতে পাই যেন। আমি এখনও দেখতে পাই আমাদের কালিঝুলিমাখা পুরোনো রান্নাঘর, আর তার ভেতরে আমার সোনালি চুলের মাকে, যিনি আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে ঝিঙে-পোস্ত রান্না করছেন অথবা ভাজা ইলিশ খুন্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আমাদের পাতে।

আমার ছিল গোপন এক ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধ। কৈশোরের সেই কবে এক ফাঁকা দুপুরবেলায়, মনে পড়ে, যখন ঝিমঝিম করছিল চারপাশ, যখন চারপাশ দিয়ে শব্দহীন ভেসে যাচ্ছিল দুপুরবেলাটা, পুরোনো বাড়ির নোনাধরা দেয়াল আর অন্ধকার কুলুঙ্গি পেরিয়ে, এক মন-কেমন-করা শান্ত বাথরুম থেকে আমি শুনেছিলাম এক শবযাত্রার চিৎকারধ্বনি। সে যে কতবছর হলো! জীবনে সেই প্রথম আমি অনুভব করেছিলাম মৃত্যু, অনুভব করেছিলাম হয়তো আমার স্নায়ু দিয়েই!—সেই দুপুরবেলাটাই বোধহয় আমার জীবনের চমৎকার সময়টাকেও নির্মমভাবে শাসন করেছে। এত নিবিড় সব ভালোবাসা থেকে, দৃশ্য থেকে, আনন্দ থেকে, আমাকেও যে একদিন বিচ্ছিন্ন হতে হবেই, এই যন্ত্রণা, বিস্ময়, সেই নির্দোষ বয়সেই কেন যে আমাকে কামড়ে ধরেছিল। আমি তো ব্যাপারটা মাকেই বলতে পারতাম সেদিন। দিদিকে বলতে পারতাম। তেমন তো মুখচোরা ছিলাম

না আমি। আমি তো উড়িয়ে দিতেও পারতাম ব্যাপারটাকে। —এ কেমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হলো আমার! ন্যাতার মতো জবজবে হয়ে গেলাম! অনেক পরে, 'একদিন মৃত্যু হবে জন্ম হয়েছে' এই সহজ স্বাভাবিক সত্যি কথাটা জানার পরেও, আশ্চর্য, কেন আমি মৃত্যুর দাসত্ব থেকে মুক্তি পাইনি? আমাকে বইতে হয়েছে এই নগ্ন খোলামেলা মৃত্যু, বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর!

অথবা সুদূর ছেলেবেলার সেই বাগবাজার। বাগবাজারের সেই গঙ্গার ধারের ভাঙাচোরা বাড়িটা। মনে আছে, মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলা না বিকেলবেলায় আজ আর মনে পড়ে না। মনে পড়ে, শুধু একটামাত্র দৃশ্য। গঙ্গার দিকে মাথা করে রোগা আর ফর্সা এক ভদ্রলোক বিছানায় শুয়েছিলেন। বুকে, গীতা। ব্যস, হলদেটে সেই রক্তহীন মুখ, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পরেও, কেন ভুলতে পারলাম না আমি?— মৃত্যু ঐরকম। আসে আর বুক বাজিয়ে চলে যায়। তুমি তার সঙ্গে কীভাবে জিতবে বলে আশা করো?

৩

ভাবনা জিনিসটা বড়োই অদ্ভুত। কখন যে মাথায় এসে ঢোকে তুমি তার কিচ্ছুটি বুঝতে পারবে না। ছেলেবেলার এক-একটা বেয়াড়া ভাবনা তোমাকে বুড়ো বয়সেও জ্বালাতে পারে। ঠিক সেই সময়েই হয়তো, যখন তুমি ভাবছ, পাইপটা এবার ধরলে হতো। ধূমপান বিষয়ে তুমি ভাবো অনেক। তবে প্রকাশ্যে এবার আর ধূমপান করতে পারবে না তুমি। বিশেষ একটা ঘরে, আলাদা একটা ঘরে, তোমাকে ঢুকে পড়তে হবে একা-একাই অথবা তোমার ধূমপায়ী বন্ধুদের নিয়ে। একুশ শতক এসে গেল। তুমি তার ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছ, হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছ। দু'তিনশো বছর পরের মানুষেরা, এই সব শতাব্দীর মানুষদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করবে একদিন। বিস্মিত হবে। ন্যক্কারজনক সামান্য ভাবনাও তোমার জুলফি ধরে একদিন টান দিতে পারে তোমাকে। তোমার ভাবনাগুলো তুমি শাদা হাওয়া-বাতাসে ধুয়ে নাও। যেমন ধরো, তোমার মাকে তুমি কষ্ট দিতে ছেলেবেলায়। ভাঙচুর করতে বাড়ি। বাবাকে ভয় পেতে। পঞ্চাশ বছর বয়সে, খালি গায়ে, শুধুমাত্র একটা আন্ডারওয়ার পরে চিলেকোঠায় বসে মনস্তাপ করা কাউকে মানায় না। বিশেষত, একটা ছটফটে মেয়ে যখন তোমাকে আজ ঘিরে আছে সারাক্ষণ। তুমি মেয়েকে নিয়ে জানলায় বসে থাক আজকাল। আজকাল তুমি আর গানই গাও না! কেন বলো তো? তুমি সুর ভুলে গেছ নাকি? কথারা হারিয়ে যাচ্ছে? চোদ্দ-পনেরো বছর আগে তোমার গলা ছিল চমৎকার। আর সারা বাড়িতে তুমি ছড়িয়ে দিতে পারতে গান। — বেদম ক্রোধের স্মৃতি বড়োই বেদনাবহ। তুমি বাবাকে রাগিয়ে দিয়েছিলে। লম্বা একটা ছড়ি হাতে তোমার বাবা উঠে এসেছিল দোতলায়। আলোর একটা রেখার মতো তুমি ছিটকে সরে

গিয়েছিলে দূরে। একরাশ অন্ধকার তোমাকে গিলে ফেলেছিল।—আচ্ছা, আবছা স্মৃতিগুলোকে নিয়ে তুমি এবার কী করবে? অবশ্য, সবকিছুই তুমি ভুলে যাচ্ছ আস্তে আস্তে। বছর বারো-তেরো আগেই তোমার ডাক্তারবাবু বলেছিলেন তোমাকে, 'কিছু কিছু জিনিস তুমি ভুলে যাবে, তা নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা কোরো না যেন।'

—কিন্তু এই ভয়াবহ বিস্মৃতি! যে দু-একটা বই তুমি ভালোবেসে জেনেছিলে একদিন, যে দু-একটা নাম, মুখ তুমি ভালোবেসে রেখে দিয়েছিলে জীবনে— ভুলেই তো যাচ্ছ সেসব। তাহলে? —তুমি খেয়াল রাখো এবার মেঘের দিন আর নীল আকাশের দিন— দেখো তো, মেঘগুলোকে কি ছেলেবেলার সিগারেট প্যাকেটের রাংতার মতো মনে হচ্ছে না?

৪

ডাক্তারবাবু গাড়ি থেকে নেমে এক অন্ধকার আধো-পরিষ্কার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'এবার কম জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকো।'

আশ্চর্য, এ কথার মানে কী? আমার কী চাওয়ার ছিল হাজার-কোটি জিনিস! আর আমি সেসব কি জানতামই না কিছু! নাকি যা হয়ে গেল, সেটা শান্তভাবে আমাকে মেনে নিতে বলছেন ডাক্তারবাবু। না, এখন উত্তেজনা বোধহয় ভালো নয়, বেশি কথা ভালো নয়, এখন থেকে শুধু দেখা আর অনুভব করা—আর, যদি সম্ভব হয়, লিখে রাখা দু'চার লাইন—স্বর্গের কথা নয়, নরকের কথা নয়, শুধু এই পৃথিবীটার কথা যেখানে গাছেরা দু'তিন পা হাঁটতে পারলে হয়তো বলে উঠত, 'আঃ, বেঁচে গেলাম'।

ডাক্তারবাবুকে মাঝে-মধ্যে বাবার মতো মনে হয়। আর আজকের সকালবেলায় তার গলার স্বরে কেমন যেন মা'-র স্নেহ! এই স্নেহও যদি আন্তরিক না হয়, সে এক তাজ্জব ব্যাপার হবে। কিন্তু, কোথায় আছি আমি? কলকাতায়? শিলিগুড়িতে? কিছু আগে, কে যেন আমার সঙ্গে খুব হাঁড়িচাচা গলায় কথা বলছিল। ঘোর কাটতেই, প্রথম যে কথাটা আমি বলতে পেরেছিলাম, 'আমার চশমা?' চশমা পরতে পরতেই আমার নজরে এসেছিল তুখোড় এক কমবয়সের ছোকরা আমাকে চশমা পরিয়ে দিচ্ছে, যে হয়তো বা আমার ছাত্র—কিন্তু ছাত্র তো নয়—এ এক দোতলা বাড়ি জালে-ঘেরা বারান্দা, বেঞ্চিপাতা, যেখানে অদ্ভুত কয়েকজন মানুষ ব'সে...যেন বা পাথরে গড়া, দুঃস্বপ্নের ভাষাসমেত চিরনির্বাসিত কয়েকটা মুখ...। যাক, কালরাতে আমি তাহলে মদ্যপানবশত কোনো ফুটপাথে শুয়ে থাকিনি, আমার চশমা চুরি যায়নি, হাতঘড়ি চুরি যায়নি, যদিও পকেট একেবারেই ফাঁকা—পকেটই তো আমার চিরকালের ব্যাঙ্ক—একশো টাকার নোট দু'তিনটে কি ছিল তাহলে? তাহলে কি এবারও ফর্সা হলো সেসব।

৫

নতুন ধরনের একটা স্বপ্ন দেখে যারপরনাই আজ খুশি হয়ে আছি আমি।

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, ঘটনা নেই এমন একটা টানা লম্বা গদ্য লিখে ফেলেছি আমি। ৫৩২ পাতার। আমাদের তরুণ এক কবি, কোথা থেকে যেন হাঁসের মতো গলাটা লম্বা করে বলে উঠল হতেই পারে না। এ সম্ভব নয়। অসম্ভব। তারপর, কী যে হলো স্বপ্নটা!

আড্ডা যে আমার ভালো লাগে— সে তো আমি আগেই জানিয়েছি। বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে। সুখী হওয়ার সাহস নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

বাস্তবিক, আমি হচ্ছি সেই ধরনের লেখক, একটা কি দুটো পাতা লেখার পরই যে-কিনা ভাবতে থাকে, গোটা একটা উপন্যাসই লিখে ফেলেছে সে। অনেক হয়েছে এবার। যথেষ্ট।

হাওয়া বইছে আজ দুপুরবেলায়। আর সরু গলায়, কোনো বাড়ির ছাত থেকে কোনো বাচ্চা মেয়ে এখন চেঁচাচ্ছে মামু, খেতে এসো। ভাত দিয়েছে।

আজকে অনেক বেশি সিগারেট হলো। এতটা ভালো নয়।

৬

পৃথিবীর সব পথই, একেকদিন মনে হয়, তাসের টেবিলের দিকে চলে গেছে। বিশেষত, শনিবার অথবা রবিবার সূর্য ডুবলেই হাঁসফাস করে ওঠে কিছু মানুষ। শীত চলে যায়, গ্রীষ্ম চলে যায়—মাস, বছর, চলে যায় গড়াতে গড়াতে। একদিন ফুরফুরে হাওয়া বইতে থাকে বাইরে। বৃষ্টি আসে। দূরে রাস্তায়, মহিলাদের হাসির শব্দ ভাসতে থাকে কখনো, গাছের শুকনো পাতাগুলো উড়তে থাকে বাতাসে। শুধু কিছু লোকের হাতে সারাবছর থেকে যায় সেই হরতন আর রুইতন—সারাবছর বাটা হতে থাকে তাস—আর ঘরের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ে কেউ, কেউ হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বর্মনদের তাস খেলা সুভাষগ্রামের মানিক চক্রবর্তী মেনে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে সুন্দর একটা কবিতাও লিখেছিলেন তিনি। আমি ছেলেবেলায় বিস্মিত হয়ে একেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবার তাস খেলা দেখতাম। বিশেষত, তাসের সাফলিং। তাস সাফলের সময় মনে হতো, বাবার দু'হাতে হাওড়ার ব্রিজটা যেন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ছে, আর কী আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই সুন্দরভাবে জেগে উঠে শুয়ে পড়ছে আবার। বাড়িতে কেউ ডাকতে এলেই, মা আমাকে অথবা দিদিদের কাউকে পাঠিয়ে দিতেন দত্ত বাড়ি থেকে বাবাকে ডেকে আনতে। এলাহি একটা ব্যাপার চলত সেখানে। কতরকমের যে হাড়ের নস্যির ডিবে, কতরকমের যে সিগারেট প্যাকেট পড়ে থাকত টেবিলে, সে এক কাণ্ড।

ফাঁকা প্রহর যখন ঝমঝমিয়ে ওঠে, সেসব সময়ে, আমিও আজকাল ঢুকে পড়ি তাসের আড্ডায়। নতুন নতুন ক্যালেন্ডার আসে বাড়িতে। আর আমি, তাস দেখি। তাসুড়েদেরও দেখতে থাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাসের থেকে তাসুড়েরা বিন্দুমাত্র কম নয় কিছু। শীতের রাতে আগাগোড়া